Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501024 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Voices of the Subaltern in Sharadindu Bandyopadhyay's Novels
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর

Maitreyi Dasgupta
SACT 1
Bengali Department
Kabi Sukanta Mahavidyalaya, Hooghly

Received on: 18th April 2026
Accepted on: 01st May 2026

Abstract:
Novels are primarily crafted around actual social phenomena. Consequently, in historical novels, the society and social dynamics of the past naturally take precedence. Now, when we speak of the 'social' aspect, can every stratum of a society — from top to bottom — truly merit significance as a subject within a historical novel? During the nascent stages of historical fiction, the central characters were predominantly drawn from lives steeped in politics — kings, princes, and the nobility. However, beginning with Bibhutibhushan's 'Ichhamati', the 'history of the voiceless masses' emerged as the primary narrative focus.

Sometime later, in the historical novels penned by Sharadindu, the common people — individuals' representative of every era and age — frequently assumed the role of decisive agents. Although the novel 'Jhinder Bandi' concludes with the protagonist triumphing in the battle of life and subsequently enjoying the luxuries of royalty, that victorious individual is, in essence, a representative of the middle class — a Bengali youth of ordinary lineage, even if not strictly belonging to the 'subaltern' class.

In the novel 'Kaler Mandira', the protagonist is of Aryan descent; yet, for the first half of the narrative, this true identity remains shrouded in mystery. He is known solely as a warrior — a spirited, fighting youth. Through this portrayal, the novelist seems to suggest that the truly extraordinary often lies hidden within the ordinary.

The protagonist of 'Gourmallar' is Vajradeva, the son of King Manavadeva; however, his true identity is that of an Abhir youth — the beloved of Gunja, an Abhir maiden — and his true sanctuary lies in the Abhir hamlet of Betsagram. Ultimately, the novel concludes with a resounding celebration of the common people; the peaceful existence of the masses is extolled far above the opulence of royalty.

In 'Tungabhadrara Tire', the man who marries Princess Vidyummala is also a representative of the common people: Arjunavarma. Another significant character in the novel is Balaram. The lives of Arjun and Balaram become intertwined through a remarkable twist of fate; moreover, the woman who ultimately becomes the King's life partner is not the Princess herself, but her companion — Manikankana. Thus, in this instance as well, the novelist underscores the inherent greatness of the common man.

Finally, in the novel 'Kumarasambhaber Kabi', as Kalidasa dedicates himself to the solitary pursuit of poetry, the very source of his poetic inspiration proves to be a humble flower-maiden. She may not possess the intellect of Princess Haimashree; yet, the novelist has demonstrated that when it comes to matters of the heart, there is absolutely no distinction between the heart of a humble gardener-girl and that of a princess. 'Bahu Juger Opar Hote' (1960) — the novelistic adaptation of the short story 'Bishkanya' — features as its central female protagonist 'Ulka': a slave-girl, cast aside by the King. While the narrative is replete from

© Santiniketan Sahityapath

beginning to end with tales of vengeance, murder, and retribution, the ultimate act of self-sacrifice that brings it to a close is made possible solely through this very slave-girl.

In the novel 'Tumi Sandhyar Megh', the two characters involved in the subplot — Ananga and Bandhuli — do not belong to the royal family; yet, within the context of this novel, they transcend the role of mere minor characters to emerge as figures of truly extraordinary stature. Indeed, Sharadindu has consistently accorded primacy to those very individuals who serve as the principal driving forces behind the unfolding drama of life.

Key Words:
The Lower Class, Historians, Ordinary People, The Public, The Middle Class, Politics, Humanity.

মূল প্রবন্ধ

ইতিহাস ও কল্পনার যথাযথ সমন্বয় সাধনেই এই বিশেষ ধারাটি গড়ে উঠতে পারে। কল্লোলোত্তর যুগে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু স্বাদের রচনা বাঙালি পাঠককে আবিষ্ট করেছিল। সেই সমস্ত শাখার মধ্যে অতীতাশ্রয়ী রচনাগুলি মুখ্যত ভারতবর্ষের অতীত দিনের চলমান ভাষ্য হয়ে উঠেছে। ইতিহাস-কল্পনার মেলবন্ধন সেখানে কতদূর সম্ভবপর হয়েছে, তা বিষয় বিশ্লেষণের পাশাপাশি তুলে আনার চেষ্টা করা হবে। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কতগুলি দিক নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রথমেই 'নিম্নবর্গ' এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব। 'নিম্নবর্গ' কারা এই নিয়ে বহু আলোচনা বহু সমালোচক ইতিপূর্বেই করেছেন। আমি কেবল তাঁদের কথাগুলিকেই একবার স্মরণ করতে চাই, এবং তা থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করব।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'এ তিনি বিভিন্ন সমালোচকদের নিম্নবর্গ সম্পর্কে অভিমত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ইংরাজি শব্দ। 'সাবঅলটার্ন' এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে নিম্নস্বর্গ। তাঁর মতে ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) 'সাবঅলটার্ন' এর ব্যাখায় শ্রেণি বিভক্ত সমাজের ক্ষমতাবিন্যাসকে দেখিয়েছেন, ''এই বিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী, ডমিন্যান্ট শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই সাবঅলটার্ন শ্রেণী।''[১] অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত প্রান্তিক শ্রেণিকেই সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গ বলা যেতে পারে। রণজিৎ গুহ'র মতে, উচ্চবর্গ হলো তারাই ''ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল।''[২] আর ''ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী ও প্রায় গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য।''[৩] উক্ত আলোচনায় প্রায় সকলেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। এই আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো সমাজের তথাকথিত উপরতলার শ্রেণিকে বাদ দিয়ে প্রায় সব শ্রেণিই নিম্নবর্গের তালিকাভুক্ত।

বাংলা উপন্যাসের জন্ম কাল থেকে বিষয়গত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় সমাজের উচ্চবর্গের প্রাধান্যই স্বীকৃত। রাজা জমিদার এরাই উপন্যাসে কাহিনির কেন্দ্রে এবং তার নিয়ামকও বটে। এমনকি কাহিনি ভাগেও সাধারণের প্রাধান্য সেভাবে উঠে আসে না। এরপর বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের রচনায় উঠে এল 'মূক জনগণের ইতিহাস'। এই পথেরই অন্যতম পথিক হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের প্রথম আলোচ্য উপন্যাস শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দী'। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম অতীত নির্ভর কাহিনি 'ঝিন্দের বন্দী'। এর আগে অবশ্য 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাইশটি পরিচ্ছেদ সমন্বিত এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক গৌরীশঙ্কর, জমিদার বংশের সন্তান। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্রকে নিম্নবিত্তের বর্গে উল্লেখ করা না গেলেও পার্শ্ব চরিত্রের মধ্যে দেখা মেলে এমন অনেকের যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। তেমনি একটি চরিত্র রুদ্ররূপ। বংশানুক্রমিক রাজার পার্শ্বচর হলেও অর্থ বা সম্মানে সে নিতান্তই নগণ্য। তার কথাতেই জানা যায়: ''আমি বড় গরীব''— পুনরায় সে বলে: ''আমরা পুরুষানুক্রমে সিপাহী। আমাদের টাকা-কড়ি নেই।''[৪]

© Santiniketan Sahityapath

উপন্যাসে এই রুদ্ররূপই ক্রমে গৌরীশঙ্করের বন্ধু হয়ে উঠেছে। এমন বন্ধু যার কাছে মনের ভাবনা ব্যক্ত করা যায়। বিশ্বাসে-ভরসায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই এ রুদ্ররূপ যেন গৌরীর সহযোগী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে রুদ্ররূপের ভালোবাসার পরিণতি দানে, গৌরীর সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়, প্রমাণ করে উপন্যাসে রুদ্ররূপও গৌরীশঙ্করের সখ্যের গভীরতা।

দ্বিতীয় যে চরিত্রের কথা উল্লেখ করতেই হয়, সে প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত। ঝিন্দ শহরে মনিহারীর দোকানের মালিক প্রহ্লাদ। ঝিন্দের রাজা সেজে অভিনয়ে রত গৌরীশঙ্কর এক রাতে হঠাৎই স্থির করে যে রাতে সে শহর পরিক্রমায় বের হবে; সঙ্গে থাকবে কেবল দেহরক্ষী রুদ্ররূপ। সেই মতো সৈনিকদের ছদ্মবেশে পথে বেরিয়ে গৌরীর চোখে পড়ে একটি দোকান, তার সাইনবোর্ডে মালিকের নাম লেখা — 'প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত'। কৌতুহলী গৌরীর মনে সন্দেহ জাগে এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাঙালি। ক্রমে ঘটনাধরার সূত্রে বোঝা যায়, প্রহ্লাদ বাংলাদেশেরই লোক। ঝিন্দে এসে ব্যবসা সূত্রে বসতি গড়েছে। এই দোকানেই গৌরী পায় একটি টেলিগ্রামের অংশ। যা থেকে বোঝা যায় প্রহ্লাদ স্টেশন মাস্টার — এরা সকলেই উদিত এবং ময়ূরবাহনের ষড়যন্ত্রের অস্ত্রস্বরূপ। প্রহ্লাদ চরিত্রের তাৎপর্য এখানেই যে চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে স্বাজাত্য প্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন গল্পকার তুলে ধরেছেন। পরের দিন গৌরীর কাছে গোপনে প্রহ্লাদ একটি চিঠি পাঠায়। তার মর্মার্থ, পূর্ব দিনের সাক্ষাতের পর প্রহ্লাদ বুঝেছে যে তার উচিত তার স্বজাতি অর্থাৎ বাঙালি গৌরীকে সাহায্য করা। উপন্যাসের শেষাংশে এসে দেখা যায় শঙ্কর সিং-কে উদ্ধার করতে গৌরী যখন দুর্গের গুপ্ত কক্ষে ঢুকতে চলেছে, তখনি সেখানে প্রহরারত অবস্থায় দেখা গেছে প্রহ্লাদকে। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো সে তখন গৌরীকে ময়ূরবাহন ও উদিতের সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা জানায়। এমনকি প্রহ্লাদই শেষ পর্যন্ত গৌরীকে শঙ্কর সিং-এর কক্ষে প্রবেশের পথ দেখায়। অর্থাৎ কাহিনির নিয়ামক প্রহ্লাদ না হলেও উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার রয়েছে। সমাজে তথাকথিত উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি না হয়েও কেবল স্বাজাত্য প্রীতির প্রদর্শনে সে গৌরীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শরদিন্দু তার রচনায় বাঙালির শীর্য বীর্য নানা সময় নানাভাবে তুলে ধরেছেন। হয়তো খানিকটা সেই অভিপ্রায় থেকেই তিনি গৌরীর সহযোদ্ধা হিসেবে প্রহ্লাদ চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা' ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিকের জীবনী আলোচনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই উপন্যাসটি শরদিন্দুবাবু লিখতে শুরু করেন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপরই বোম্বাই থেকে কাজের ডাক আসায় কাহিনি অসমাপ্ত রেখে তিনি বোম্বাই চলে যান। দশ বছর পর ১৯৪৮ সালে আবার উপন্যাস পুনরায় শুরু করেন। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি জানিয়েছেন যে এ গল্পের পটভূমিকা হিসেবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম ভাগে উল্লিখিত হূন আক্রমণ ও গুপ্ত বংশের শাসন কালের কথা ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চিত্রক। আশ্চর্য দক্ষতায় এই চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। কাহিনির প্রারম্ভে চরিত্রটির পরিচয় সে এক ভাড়া করা সেনানী মাত্র। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের রাজার হয়ে যুদ্ধ করাই তার জীবিকা। পরবর্তীতে কাহিনি অগ্রগতির সঙ্গে জানা যায় যে সে যুবরাজ। তার প্রকৃত নাম তিলক বর্মা। তার ধাত্রী পৃথার মুখ থেকে সেই ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে। রাজ পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার জীবনেতিহাস পরিবর্তিত হয়নি। বরং তা গোপন রেখে সে জীবনযুদ্ধকে বজায় রেখেছে। রাজকুমারী রট্টার সঙ্গে মগধ যাত্রা। রাজকুমারীর সঙ্গে হৃদয় বিনিময়। এ সবই ঘটেছে তার প্রকৃত পরিচয়কে গোপন রেখে। তাই রাজপুত্র হলেও উপন্যাসে মূলত সে এক সাধারণ সৈনিকমাত্র। অথচ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতেই তার অবস্থান। আরো একটি বিষয় প্রসঙ্গসূত্রে লক্ষ করার মতো যে উপন্যাসটিতে স্কন্দগুপ্তের মতো ঐতিহাসিক চরিত্র থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়েছে চিত্রকের মতো এক সাধারণ সেনানী। তার আচরণে এবং যাপন ধারায় উঠে আসে এক যোদ্ধা যুবকের উজ্জ্বল চরিত্র, যে অভিজাত বংশজাত হয়েও সাধারণ, ক্লেশকর জীবনের অভ্যাসে তেজি ও তরতাজা। এভাবেই কালের মন্দিরা বাদক হয়ে ওঠে সাধারণের প্রতিনিধি।

'কালের মন্দিরা'য় চিত্রক ছাড়াও একাধিক চরিত্রের সমাবেশ। এমনি একটি চরিত্র পৃথা। হূন আক্রমণের পূর্বে সে ছিল রাজপুত্রের ধাত্রী। বলাবাহুল্য এই রাজপুত্রই বর্তমানের চিত্রক। রাজপরিবারের দাসী স্থানীয় চরিত্র পৃথা উপন্যাসে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। চিত্রকের জীবনের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে তারই স্মৃতিচারণায়। উপন্যাসের অপর এক হূন চরিত্র মোঙ। তার বয়ান অনুযায়ী রাজপুরী হূন অধিকৃত হবার পর শিশু রাজপুত্রকে নিয়ে পালায় চুফাঙ নামের অপর এক হূন; রাজপুত্রের ধাত্রীর কী পরিণতি হয় তা সে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না।

© Santiniketan Sahityapath

এদিকে হূন রাজকুমারী রট্টা যশোধরার অশ্বচুরির অপরাধে যখন চিত্রক অন্ধকূপে বন্দী, সেখানেই সে সাক্ষাৎ পায় বন্দী পৃথার। মুক্তি পাওয়ার পর চিত্রক রাজকুমারীর কাছে তারও মুক্তি প্রার্থনা করে। যশোধরার সখী সুগোপা চিত্রকের মুখে সেই বন্দিনীর নাম শুনে বুঝতে পারে এই নারীই তার হারানো মা। এরপর সুগোপার অনুরোধে মৃতপ্রায় পৃথাকে সে দেখতে যায় তাদের গৃহে। সেখানে পৃথা অতীত স্মৃতিচারণায় জানায় সে ছিল রাজপুত্রের ধাত্রী, রাজপুত্রের ভ্রু যুগলের মধ্যে একটি জড়ুল ছিল। তা সবসময় বোঝা যেত না, কেবল শিশু পুত্রটি যখন কেঁদে উঠত বা ক্রুদ্ধ হত তখন তা তিলকের মতো জ্বলজ্বল করে উঠত। তাই তার নাম ছিল তিলক বর্মা। একথা শুনে নিজের এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারে চিত্রক ও তার ভ্রূ মধ্যস্থ জড়ুলটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যা দেখে পৃথা তাকে তিলক বর্মা বলে চিনতে পারে। চিত্রক ভেবেছিল রাজপুরী থেকে পালানোর একটা সুযোগ সে পেয়েছে। এবার সে পালাতে পারবে; কিন্তু তার এই পরিচয় জানার পর সে তার সিদ্ধান্ত বদল করে। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সিংহাসন তারই প্রাপ্য; অথচ ভাগ্যের ফেরে আজ যে পরিচয়হীন। এই বোধহয় চিত্রককে জীবনের পালাবদল ঘটায়। তাই গল্পের গতিতে নতুন দিকে চালনা করায় রাজদাসী পৃথার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

উপন্যাসে ইতিহাসের নানা প্রতিচ্ছবি থাকলেও ঘটনা ও চরিত্রাবলির মধ্যে দিয়ে একটিই মুখ্য সুর ধ্বনিত হয়েছে। মানবতার প্রকৃত ইতিহাস মিলনের ইতিহাস, বিভেদের নয়। আর এই ইতিহাসের নিয়ামক শুধু রাজা-মহারাজা নয় সমাজের সাধারণ মানুষ। তাই উপন্যাসের নায়ক রাজপুত্র হলেও তার প্রাথমিক পরিচয়ে সে এক সেনা।

সমাজে নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি ঔপন্যাসিকের যে মনোযোগ তা পরবর্তী উপন্যাস 'গৌড়মল্লার'এও বিশেষভাবে বিরাজমান। এর আগের উপন্যাসে মূলত হূন কন্যা ও রাজ্যের হিন্দু রাজার পুত্র চিত্রকের কাহিনি ছিল। এই উপন্যাসে কিন্তু বাঙালির জাতীয় জীবনপদ্ধতির একটা সামগ্রিক চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে ঐতিহাসিক ঘটনাধারা বর্ণিত হলেও বাংলাদেশের ইতিহাস কখনো বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হয়নি। অথচ বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ডায়েরি অনুসরণে তা জানা যায়। নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থ পাঠ করে তিনি শশাঙ্কের মৃত্যু পরবর্তী গৌড়বঙ্গের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচনা করেন 'গৌড়মল্লার' (১৩৬১ বঙ্গাব্দে) প্রথমে এই উপন্যাসের তিনি নামকরণ করেন 'মৌরী নদীর তীরে' কয়েক পরিচ্ছদ লেখার পর উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'গৌড়মল্লার'।

কাহিনির সূচনা ঘটেছে বাংলাদেশের এক পল্লীগ্রামে — বেতসগ্রাম যার নাম। কাহিনির মুখ্য চরিত্র বজ্র ওরফে বজ্রদেব। বাংলার শাসক রাজা শশাঙ্কের পৌত্র ও মানবদেবের পুত্র এই তার পরিচয়। তবে এখানেও ঔপন্যাসিক দেখালেন রাজরক্তের মধ্যেও বহমান সাধারণের জীবনস্রোত। পূর্ববর্তী উপন্যাসে যেমন চিত্রকের রাজ পরিচয়টি প্রাথমিকভাবে সামনে আসেনি, বজ্রও তেমনি রাজসিংহাসনে বসেছে মাত্র একদিনের জন্য। অর্থাৎ রাজশক্তির আড়ালে সাধারণ মানুষের শক্তি যে গুপ্তভাবে থেকে যায় তাকেই যেন বোঝাতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। রাজা শশাঙ্কের পৌত্র এই পরিচয় গৌণ হয়ে তাই প্রধান হয়ে ওঠে এটাই যে আভীর যুবক বজ্র পল্লীগ্রামের আলো ছায়ায় বেড়ে ওঠা তরতাজা প্রাণ। উপন্যাসে দেখা যায় বজ্র রাজধানীর রাজনীতি কর্কশ জীবন পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসে তার গ্রামটির শান্ত জীবনের অভিমুখে। সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে তার সাফল্যও সাধারণের শক্তিকে যেমন প্রতিষ্ঠা দেয়, তেমনি শেষপর্যন্ত সরল গ্রামজীবনেই আবার প্রত্যাবর্তনের মধ্যেও তারই ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়।

উপন্যাসটির পটভূমিকাকে দুটি অংশে ভাগ করলে দেখব প্রথম পটভূমিকা মৌরি নদীর তীরে বেতসগ্রাম, দ্বিতীয়টি গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। তবে দুটি ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে সেইসব চরিত্র ও জীবনাবলি যারা না থাকলে কালের অগ্রগতি যেত থমকে, অথচ যাদের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ নেই। গ্রামের মানুষ গোপা, রঙ্গানা, চাতক ঠাকুর, গুঞ্জা, বনের শবর কচ্ছু, তিত্তি মিত্তি এরা যেমন জীবনের উত্তাপে ভরপুর, তেমনি স্রোতশীল রাজধানীর চরিত্রাবলি কবি বিম্বাধর, পান্থশালা মদিরাগৃহের মালিক কপট বটেশ্বর। কিংবা রাজপরিমণ্ডলে থাকা কুহু, মন্ত্রী কোদন্ত মিশ্র এরা সকলেই একইভাবে প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক। সব মিলিয়ে এ উপন্যাস কখনোই কেবলমাত্র রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত নয়। অনেকেই 'গৌড়মল্লার'কে বিভূতিভূষণের 'ইচ্ছামতি' শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাহাজাদা দারাশুকো' ইত্যাদি উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে চেয়েছেন যে, উক্ত উপন্যাসগুলিতে যেভাবে সমাজের প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি রয়েছে 'গৌড়মল্লার'এ তা নেই। আসলে 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসে ইতিহাসের ক্রান্তিকালের ছবি;

সেখানে রাজধানীর জটিলতা ষড়যন্ত্র ও গ্রামজীবনের সারল্য একই আবেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তা যেমন কেবল রাজপরিবারের কাহিনি নয়, তেমনি কেবল নিম্নবর্গের ইতিহাসও নয়; এক সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি, বলা ভালো — গ্রাম ও নগরজীবনের নানা স্তরের মানুষের ইতিবৃত্ত। উপন্যাসের শেষাংশে মানবদেবের উক্তিতেই তার সমর্থন মেলে: ''আমার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে বসেছে — হোক একদিনের জন্য — আমার আর দুঃখ নেই। কিন্তু আর্য শীলভদ্র যথার্থ বলেছেন, আজ থেকে ও কথা ভুলে যেতে হবে। আমরা গৌড়দেশের সামান্য গ্রামবাসী, এই আমাদের পরিচয়। আমাদের রক্ত জনসাধারণের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে, এই আমাদের গৌরব। রাজৈশ্চর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগ যুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।''[৫]

মগধে দ্বিতীয় পাল বংশের রাজত্বকাল ও নর্মদার দক্ষিণ-পশ্চিমে চেদি রাজ্যের কলচুরি বংশের রাজত্বকাল 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' উপন্যাসের উপজীব্য। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শরদিন্দুবাবুকে বাংলার পাল রাজাদের নিয়ে উপন্যাস লেখার অনুরোধ করেন, এমনকি উপাদানও দিয়েছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের একটি নামও ঠিক করেন 'যৌবনশ্রী'। শরদিন্দুবাবুর ডায়েরি থেকে আরো জানা যায় যে, উপন্যাসটির কয়েকটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিতে এর নাম ছিল 'রেবা রোধসি'।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। আলোচ্য উপন্যাসের সময়কাল ধরে নেওয়া যায় ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে। পঞ্চদশ শতকের দাক্ষিণাত্য বিজয়নগর নামে যে হিন্দু রাজ্যটি তার পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাজ্যগুলি বিশেষত প্রতিবেশী বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়েছিল। সেই রাজ্যটি এই কাহিনির পটভূমি। গল্পের প্রধান চরিত্র বিজয়নগর রাজ্যের রাজা দেবরায়, কলিঙ্গ রাজ্যের দুই রাজকন্যা — বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কনা, সর্বোপরি গুল বর্গা থেকে আগত ক্ষত্রিয় যুবক অর্জুনবর্মা। নায়ক নায়িকা ছাড়াও আরো এক চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বলরাম। আত্মপরিচয় থেকে জানা যাচ্ছে যে সে বর্ধমানের লোক। সেখানে তার বিরাট কামারশালা ছিল। তার কথায়, ''কাস্তে কুড়ুল কাটারি তৈরি করতাম, ঘোড়ার ক্ষুরে নাল ঠুকতাম। গরুর গাড়ির চাকায় হাল বসাতাম। তলোয়ার, সড়কি এমনকি কামান পর্যন্ত তৈরি করতে জানি।''[৬] এমন যখন তার পসার সে সময় মুসলমান শাসকের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে দেশ ছেড়ে সে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে সে আশ্রয় নেয় যবন মুক্ত রাজ্য কলিঙ্গে। কলিঙ্গের রাজকন্যার সঙ্গে বিজয়নগরের রাজার বিবাহ স্থির হয় ও রাজকন্যাকে বিজয়নগর পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। এ সময় রাজকন্যার সঙ্গে আসা নৌবহরে কাজ নেয় সে। এইভাবে সে এসে পৌঁছায় বিজয়নগরে। পথে তার আলাপ হলো অর্জুনবর্মার। এরপর অর্জুনবর্মার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে উপন্যাসে তার অবস্থান। এমন কি কাহিনির অগ্রগতিতে অপরিহার্য চরিত্ররূপে সে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুনবর্মার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থেকেছে। তার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে, অর্থাৎ যেখানে বাহমনী রাজ্যের বিজয়নগরের উপর অতর্কিত আক্রমণের প্রসঙ্গ এসেছে সেই অংশে অর্জুনবর্মার পাশাপাশি বলরামের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্জুনবর্মাই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও বলরামের সহায়তা ভিন্ন সে কখনোই সাফল্য পেতে পারত না। নির্বাচিত অর্জুনবর্মা যখন বাহমনী রাজ্যের অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানতে বিজয়নগর যাত্রা করে, সে সময় বলরাম তার নির্মিত ছোটো কামান দিয়ে শত্রুপক্ষকে আটকে না রাখলে অর্জুনবর্মার তার কার্যে সিদ্ধি লাভ করত না। এভাবেই সামান্য কর্মকার হয়েও উপন্যাসের গতিদানে তার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে যে চরিত্রের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুনবর্মা। যাদব বংশীয় ক্ষত্রিয় এই তার পরিচয় যদিও, তবুও একথা মানতেই হয় যে প্রকৃতপক্ষে সে সাধারণের প্রতিনিধি। ঔপন্যাসিক তার মধ্যে যেভাবে মানুষের ধর্ম, জীবনের ধর্ম, সাহসিকতা ও স্বদেশপ্রীতির ধর্মকে আরোপ করেছেন তাতে সে হয়ে উঠেছে আমাদের বড়ো কাছের মানুষ। সর্বোপরি আমাদের কল্পলোকে থাকা এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে যেন আমাদের না পারা কাজ বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। তাই সার্থকভাবেই অর্জুনবর্মার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রাধান্য উপন্যাসে স্বীকৃত হয়েছে।

পরবর্তী আলোচনা করব 'কুমারসম্ভবের কবি' এই উপন্যাসটি নিয়ে। এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ 'কালিদাস'। ঔপন্যাসিক স্বীকার করেছেন যে কালিদাস সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য বা জীবনী তিনি পাননি। সবটাই প্রচলিত কিংবদন্তিকে নির্ভর করে। এর আগে যে সমস্ত উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে সেখানে এক বা একাধিক সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি থাকলেও শাসকের প্রতিনিধি এবং

তার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। অথচ এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক কবি। প্রথম জীবনে যে ছিল এক মূর্খ, পরিচয়হীন ব্যক্তি। কুন্তল রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের কেন্দ্রেও রয়েছে এই মূর্খামি। যখন তার মূর্খামি ধরা পড়ল তখন সে নির্বাসিত হলো। এরপর শুরু তার নিজেকে পুনর্গঠিত করার পালা। কালিদাস চরিত্রের যে দিকটি এ উপন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা হলো কালিদাসের সারল্য। রাজৈশ্বর্যের বাইরে অবস্থান করে তিনি প্রেমে স্বতঃস্ফূর্ত, স্নেহে নিঃশর্ত। সাধারণ মানব চরিত্রের মধ্যে যে গুণ কাম্য তা কালিদাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন শরদিন্দু। কালিদাসের ব্যাকুলতাকে, বিরহীর যন্ত্রণাকে তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শরদিন্দু এই সত্যটিকেই পাঠক সম্মুখে উদ্ঘাটন করেছেন। শরদিন্দু যক্ষের বিরহ আর কালিদাসের বিরহকে একই প্রযত্নে উচ্চারণ করেছেন।

উপন্যাসে অপর যে চরিত্রের কথা না বললে চলে না, সে মালিনী। বাগদেবীর বর লাভ করে পাণ্ডিত্যের, কাব্যচর্চার শীর্ষ স্পর্শ করে কালিদাস ফিরছেন। পথে স্থির করলেন অবন্তী রাজ্যেই তিনি বাস করবেন। সেই অবন্তী রাজ্যে যখন তিনি কুঁড়েঘর তৈরি করে বাস করছিলেন তখন স্মৃতি তাঁকে উদ্বেল করেছে। এই সময় মালিনীর আবির্ভাব। নারীই গৃহের লক্ষ্মী এই সত্য তিনি আবিষ্কার করেন মালিনীর সান্নিধ্যে এসে। মালিনীকে শ্লোক রচনা করে শোনান তিনি। মুগ্ধ শ্রোতা, কালিদাসকে আরো অনুপ্রাণিত করে। মালিনীই যেন শব্দ জুগিয়ে যায় কালিদাসের কলমে। এই দুই নরনারীর মধ্যেও ঘটতে থাকে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। মালিনীর বারংবার অনুরোধেই কালিদাস অবশেষে রাজি হন রাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষী ভানুমতীকে কাব্য শোনাতে। এই সূত্র ধরেই পুনরায় কালিদাস ও হৈমশ্রীর সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলন সম্ভবপর হয়। মালিনী চরিত্রকে উপন্যাসে 'উপেক্ষিতা' বলেছেন অনেকেই। তবুও একথা ভুললে চলবে না যে সে হৈমশ্রীর পরিচারিকা চতুরিকা নয়, ভারতচন্দ্রের দৌত্যকারী মালিনীও নয়, সে এক সরল পল্লীবালা। তার ভালোবাসা, আত্মনিবেদন ও আত্মত্যাগে কালিদাস ও হৈমশ্রীর দাম্পত্যের পুনর্জন্ম ঘটেছে; কাহিনির অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে মালিনী।

শরদিন্দু এই উপন্যাসে ইতিহাস থেকে রাজাদের তুলে এনে সাধারণের কথা বলেছেন, কবির কথা বলেছেন আর রাজপ্রতিনিধি হৈমশ্রীকে দিয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়ে নিয়েছেন। হৈমশ্রী যখন ফিরে আসেন কালিদাসের পর্ণকুটীরে, তখন কালিদাস দারিদ্র্যের অজুহাত দেখিয়ে তাঁর মালা নিতে অস্বীকার করেন। কালিদাস জানতেন কোথায় রাজৈশ্বর্য আর কোথায় শিপ্রাতীরের কুটীরের সাদামাটা জীবন। তবে হৈমশ্রীকে তখন আর কোনো কিছুতেই ফেরানো গেল না। দারিদ্র্যকেই তিনি তখন ভূষণ মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার কবি ও তার স্ত্রীর কথা এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায়। 'পুরস্কার' কবিতার কবিপত্নীর মতোই হৈমশ্রীও অর্থকে তুচ্ছ করে কবিত্ব শক্তিকেই বরণ করে বরমাল্য পরিয়ে দেন কালিদাসকে। এইভাবেই শরদিন্দু দেখিয়েছেন কেমন করে রাজকন্যা তাঁর চিত্তকে টেনে আনেন পর্ণকুটীরে। সর্বার্থভাবে তাই এ উপন্যাসে ধ্বনিত হয় সাধারণ কবির এবং মালিনীর তথা নীচু তলার মানুষের জয়ধ্বনি।

শরদিন্দুবাবুর ছোটোগল্প 'বিষকন্যার' উপন্যাসরূপ 'বহু যুগের ওপার হতে'। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র উল্কা শিশুনাগ বংশের রাজা চণ্ডের ঔরসজাত ও দাসীর গর্ভজাত কন্যা। গল্পের শুরু থেকে শেষ উল্কাকে ঘিরেই। ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অত্যাচারী রাজা চণ্ড শুনলেন মোরিকা দাসীর গর্ভে তাঁর এক কন্যা সন্তান হয়েছে এবং সে বিষকন্যা। একথা রাজজ্যোতিষী গণনায় জানালে, রাজা মোরিকাকে আদেশ দিলেন কন্যাকে হত্যা করতে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে মৃত্যু ঘটে নি উল্কার। রাজ্য থেকে বিতাড়িত ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত মহাসচিব শিবমিশ্র তাকে উদ্ধার করে। সময় বয়ে যায় আপনগতিতে। সেদিনের বিষকন্যা আজকের উল্কা। সে লিচ্ছবির রাষ্ট্রদূত হয়ে মগধে এসেছে শিশুনাগ বংশকে নিঃশেষ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। শিশুনাগ বংশের সন্তান ও বর্তমান রাজা সেনজিতকে নিজের প্রেমের নিগড়ে বেঁধে তাকে হত্যা করার অভিপ্রায় ছিল উল্কার। কিন্তু বাস্তবে সে নিজেই সেনজিতের প্রতি ভালোবাসার আগুনে দগ্ধ হয়েছে। আর তাই সে চায়নি তার অভিশপ্ত জীবনকে সেনজিতের জীবনের সঙ্গে জড়াতে। বেছে নিয়েছে মৃত্যুকে। মৃত্যুর মুহূর্তে সে সেনজিতকে বলেছে, "এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালোবাসা-প্রিয়তম,...।"[৭]

কাহিনির শেষে এসে তাই মনে হয় সে বিষকন্যা নয়, কেবলমাত্র ভালোবাসার জন্য আত্মত্যাগে উদ্ভাসিত এক নারী। যে নারী ছিল কেবলই এক দাসীর কন্যা। ভালোবাসার অধিকার তো সকলেরই সমান রাজা রানী, দাস-দাসী। আলোচ্য উপন্যাসে 'বিষকন্যা' উল্কা তার আত্মহতির মধ্যে দিয়ে তার হৃদয়ের বিশালতা বুঝিয়ে দিয়েছে। ঔপন্যাসিক যেন বোঝাতে চাইলেন বিষকন্যা সুলভ অপবাদের অবসান সে তার ভালোবাসা দিয়ে করে গেছে। 'বিষকন্যা' গল্পটিতে শরদিন্দুবাবু পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নটিই রেখেছেন: "উল্কা যদি প্রিয়প্রাণহন্তী বিষকন্যাই ছিল, তবে সেনজিৎ না মরিয়া সে নিজে মরিল কেন।"[৮]

© Santiniketan Sahityapath

শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের তথ্য ও কল্পনার মধ্যে যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে কল্পনার মধ্যেই তিনি অতীতকে ধরতে চেয়েছেন। এই সমস্ত উপন্যাসে তাই ইতিহাসের সত্য এটাই যে —

"শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।"

তথ্যসূত্র:

১। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৩
২। ওই, পৃ. ৩২
৩। ওই, পৃ. ৩১
৪। 'শরদিন্দু অমনিবাস' (নবম খণ্ড) প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম সং, ১৯৮০, পৃ. ৪৯
৫। 'শরদিন্দু অমনিবাস' (তৃতীয় খণ্ড) প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আশ্বিন ১৪০৪, পৃ. ২৬২
৬। ওই, পৃ. ৫০১
৭। 'শরদিন্দু অমনিবাস' (দশম খণ্ড), প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ, ১৩৮৮, পৃ. ১২৬
৮। 'শরদিন্দু অমনিবাস' (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৭৭

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', ভারবি প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫১
২। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (১ম খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৭
৩। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (২য় খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৮
৪। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৩য় খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৪, ২য় সং
৫। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৪র্থ খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৭৪
৬। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৫ম খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৮২
৭। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৬ষ্ঠ খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স ,কলকাতা, মার্চ ১৯৭৬
৮। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৭ম খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুআরি ১৯৭৭
৯। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৮ম খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুআরি ১৯৭৮
১০। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (৯ম খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ১৯৮০
১১। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (১০ম খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুআরি ১৯৮২
১২। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (১১শ খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৩৯২
১৩। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, 'শরদিন্দু অমনিবাস (১২শ খণ্ড)', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৪

সহায়ক গ্রন্থ:

- অরবিন্দ সামন্ত, 'সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০২
- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪
- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের ১০০ বছর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ
- ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)', গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮
- ক্ষেত্র গুপ্ত, 'রমণীয় শরদিন্দু', গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা বৈশাখ ১৪১৯ দ্বিতীয় প্রকাশ
- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০
- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪
- গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৪
- জগদীশ ভট্টাচার্য, 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী', ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৭
- নবনীতা চক্রবর্তী, 'বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ২০০২
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', কলকাতা, প্রকাশ ভবন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

—

© Santiniketan Sahityapath